অধ্যায় - ৭

অদ্ভুত অবতার, শ্রী সাইবাবার প্রকৃতি, তাঁর যোগক্রিয়া, কুষ্ঠ রোগীর সেবা, খাপার্ডের ছেলের প্লেগ, পন্ঢরপুর যাত্রা।

যদি এমনটা বলা হয় যে, শ্রী সাইবাবা হিন্দু ছিলেন তাহলে এও সত্য যে, তাঁকে দেখলে মুসলমান বলেই মনে হতো। কেউ নিশ্চিত করে আজ পর্যন্ত বলতে পারেনি যে, তিনি হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান। তিনি হিন্দুদের রামনবমীর উৎসব যথাবিধি পালন করতেন এবং তার সাথে-সাথে চন্দনোৎসবও। এই উৎসব উপলক্ষে পর্যাপ্ত পুরস্কারও দিতেন। গোকুল অষ্টমীতে তিনি গোপাল কালা সমারোহও বড় ঘটা করে পালন করতেন। 'ঈদ'- এর দিন তিনি মুসলমানদের মস্‌জিদে 'নমাজ' পড়বার জন্য আমন্ত্রিত করতেন। এক সময় 'মহরম উপলক্ষে কিছু মুসলমান 'তাবুদ' বানিয়ে কিছুদিন মস্‌জিদে রেখে তারপর সেটা নিয়ে মিছিলে বেরোবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। শ্রী সাইবাবা কেবল চারদিন তাবুদটি মস্‌জিদে রাখতে দেন এবং পঞ্চমদিন বিনা কোন হৈ-হল্লা করে সেটি ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বলেন।

যদি এমনটা বলা হয় যে তিনি মুসলমান ছিলেন, তাহলে এও দেখা গিয়েছে যে হিন্দুদের মতন তাঁর কানে ফুটো ছিল। যদি কেউ তাঁকে হিন্দু বলে ঘোষণা করে, তাহলে এও সত্য যে তিনি সদা মস্‌জিদে থাকতেন এবং যদি মুসলমান বলা হয়, তাহলে তিনি সর্বদা 'ধুনি' প্রজ্জ্বলিত রাখতেন। এমন অনেক কর্ম যেগুলি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে- যেমন যাঁতা পেষা, শাঁখ বাজানো, ঘন্টাদি, হোম, অন্নদান ও অর্ঘ্য দ্বারা পূজো করা ইত্যাদি, সবসময়ই সেখানে হতো। নানাসাহেবের (যিনি বাবার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন) মতে বাবার নিজের ছুন্নৎ ছিল না ("বাবা হিন্দু না যবন"; প্রবন্ধ-বি.ভি. দেব)।

এরপরও যদি কেউ বলে যে তিনি মুসলমান ছিলেন তো কূলীন ব্রাহ্মণ ও অগ্নিহোত্রীরাও নিজেদের নিয়ম উল্লংঘন করে সদা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন। যারা বাবার জন্মস্থান বা স্বদেশ খোঁজ করতে গিয়েছিল, তারা নিজেদের প্রশ্ন ভুলে তাঁর দর্শনমাত্রেই অভিভূত হয়ে পড়ে। অতএব আজ পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেনি যে বাবা হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান। এতে আশ্চর্য্য হওয়ারই বা কি আছে? যিনি অহং ও ইন্দ্রিয়সুখগুলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঈশ্বরের শরণে চলে গেছেন এবং ঈশ্বরের

সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তার আর কোন জাত পাত থাকে না। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জাতি বা প্রাণীদের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ভেদ করতেন না। ফকিরদের সঙ্গে তিনি আমিষ আর মাছও খেয়ে নিতেন। কুকুররাও ওর খাবার পাত্রে মুখ দিয়ে আনন্দসহকারে খেতো, কিন্তু তিনি কখনো কোন আপত্তি করতেন না। এমনি অপূর্ব ও অদ্ভুত অবতার ছিলেন শ্রী সাইবাবা। গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপ তাঁর শ্রী চরণে বসে তাঁর সৎসঙ্গের সুখ উপভোগ করার সৌভাগ্য আমারও হয়। আমি যে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করেছিলাম, সেটা কিভাবে বর্ণনা করতে পারি? যথার্থে বাবা ছিলেন অখন্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁর মহান ও অদ্বিতীয় চরিত্র কেই বা বর্ণনা করতে পারে? তাঁর শ্রীচরণের আশ্রয় নিয়ে ভক্তরা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। অনেক সন্ন্যাসী সাধক ও মুমুক্ষুজন তাঁর দর্শন করতে আসতেন। বাবাও তাঁদের সাথে উঠতেন-বসতেন, চলতেন ফিরতেন, তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে ওঁদের চিত্তরঞ্জন করতেন। 'আল্লাহ মালিক' সর্বদাই তাঁর মুখে লেগে থাকত। তিনি কখনো বিবাদ বা তর্কাতর্কিতে যেতেন না এবং সবসময় শান্ত ও স্থির থাকতেন। কিন্তু কখনো-কখনো তিনি রেগেও যেতেন। লোকেদের বেদান্তর শিক্ষা দিতেন। কেউ শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি যে, শ্রী সাইবাবা কে ছিলেন? গরীব হোক বা বড়লোক - সবাই তাঁর কাছে সমান। তিনি সবার গোপনীয় কাজ জানতেন এবং যখন তাদের সামনে সেই রহস্য প্রকাশ করে দিতেন, তখন তারা অবাক হয়ে যেত। স্বয়ং জ্ঞানাবতার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা অজ্ঞানেরই ভান করতেন। তাঁর মান সম্মানের আড়ম্বর ভালো লাগত না। এইরূপ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি শরীরধারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্ম তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেয়। শিরডীর নর - নারীরা তাঁকে পরমব্রহ্ম সরূপ মানত।

বিশেষ ঃ-

(১) শ্রী সাই বাবা তাঁর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত মহালসাপতিকে (যিনি বাবার সঙ্গে মস্‌জিদেও চাওড়ীতে শুতেন) বলেছিলেন- "আমার জন্ম পাথর্ডীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল। আমার বাবা-মা আমাকে বাল্য অবস্থাতেই এক ফকিরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।" যে সময় এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, পাথর্ডী থেকে কিছু লোক সেখানে এসে পৌঁছয়। বাবা তাদের পাথর্ডীর কিছু লোকেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমতি কাশীবাঈ কানেট্‌কর (পুণার এক প্রসিদ্ধ বিদূষী মহিলা) নিজের অভিজ্ঞতায় লেখেন- 'বাবার চমৎকারের কথা শুনে আমরা নিজেদের ব্রহ্মবাদী সংস্থার পদ্ধতির অনুসারে বিবেচনা করছিলাম। বিবাদের বিষয় ছিল যে, শ্রী সাইবাবা ব্রহ্মবাদী না বাম্মার্গী। কালান্তরে যখন আমি শিরডী যাই, তখন এ সম্বন্ধে আমার মনে নানারকমের প্রশ্ন

উঠেছিল। মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা রাখতেই বাবা উঠে আমার সামনে এসে নিজের বুকের (হৃদয়) দিকে সংকেত করে আমার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলেন- "এইটি ব্রাহ্মণ, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। এর বাম্ মার্গের সাথে কি প্রয়োজন? এখানে কোন মুসলমান প্রবেশ করার দুঃসাহস করতে পারে না এবং করাও উচিত নয়। এই ব্রাহ্মণ লক্ষ-লক্ষ মানুষের পথ প্রদর্শণ করতে এবং তাদের অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি করাতে সক্ষম। এটা ব্রাহ্মণের মস্‌জিদ। আমি এখানে কোন বাম্মার্গীর ছায়াও পরতে দেব না।"

বাবার প্রকৃতি ঃ-

আমার মত মূর্খ শ্রী সাইবাবার অদ্ভুত লীলার বর্ণনা করতে পারবে না। শিরডীর প্রায় সব কটি জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার বাবাই করিয়েছিলেন। শ্রী তাত্য়া পাটীলকে দিয়ে শনি, গণপতি, শিব-পার্বতী, গ্রামদেবতা ও হনুমানজীর মন্দির মেরামত করান। তাঁর দানও বিলক্ষণ ছিল। দক্ষিণা রূপে যে টাকা একত্রিত হত, তার মধ্যে থেকে কাউকে কুড়ি টাকা, তো কাউকে পনেরো টাকা বা কাউকে পঞ্চাশ টাকা প্রতি দিন স্বচ্ছন্দে বিতরণ করতেন। যারা সেই টাকা পেতো, তারা এটিকে শুদ্ধ দান মনে করতো। বাবাও সর্বদা চাইতেন যে, সেটি উপযুক্ত রূপে খরচ করা হোক। বাবার দর্শন করে ভক্তরা অনেক ভাবে লাভবান হতো। অনেকে নিষ্কপট ও সুস্থ হয়ে যেত, দুষ্টাত্মা পুণ্যাত্মায় পরিণত হয়ে যেত, অনেক কুষ্ঠ রোগী মহারোগ হতে মুক্তি পেয়েছে এবং কত লোক মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করে সুখী হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রীদের দল শিরডীতে আসতে শুরু করে। বাবা সব সময় ধুনির কাছেই বসতেন এবং ওখানেই বিশ্রাম করতেন। তিনি কোন-কোন দিন স্নান করতেন আবার কখনো-কখনো দিনের পর দিন স্নান না করেই সমাধিতে লীন থাকতেন এবং দেহ ঢাকবার জন্য একটা 'অঙ্গরক্‌খা' পরে থাকতেন। তাঁর বেশভূষা শুরু থেকেই এরকম ছিল। জীবনের পূর্বার্দ্ধে তিনি গ্রামে চিকিৎসা কার্য্যও করতেন। রোগীদের ওষুধ দিয়ে তাদের সুস্থ করে দিতেন। তাঁর হাতে অপরিমিত যশ ছিল। তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি যোগ্য চিকিৎসক রূপে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে শুধু একটাই বিচিত্র ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

চোখের বিলক্ষণ চিকিৎসা ঃ-

একটি ভক্তের চোখ অত্যধিক লাল হয়ে ফুলে উঠেছিল। শিরডীর মতো একটা ছোট্ট গ্রামে ডাক্তার কোথায়? তখন সবাই রোগীকে বাবার কাছে নিয়ে এলো। এই ধরনের ব্যাধিতে ডাক্তারেরা সাধারণতঃ প্রলেপ, মলম, কাজল, গরুর দুধ বা কর্পূর

ওষুধ রূপে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বাবার ঔষধি ত একেবারেই ভিন্ন ছিল। তিনি কিছু 'ভেলা'-র বিচী (bibba seeds) পিষে তার দুটো গুলি বানিয়ে রোগীর চোখে এক-একটা গুলি চেপে দিয়ে কাপড়ের পট্টী বেঁধে দিলেন। পরের দিন পট্টী সরিয়ে চোখে জলের ছিটে দেওয়া হলো। ফোলা ভাবটা কম হয়েগিয়েছিল এবং চোখ প্রায় নিরোগ। চোখ শরীরের একটা খুবই সুকোমল অঙ্গ। বাবার ওষুধে চোখের কোনরকম ক্ষতি হয় না বরং চোখের কষ্ট দূর হয়ে যায়। এইভাবে অনেক রোগী নিরোগ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এই ঘটনাটি এখানে উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হলো।

বাবার যৌগিক ক্রিয়া ঃ-

বাবা সমস্ত যৌগিক ক্রিয়া জানতেন। তার মধ্যে শুধু দুটিরই উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

১) নাড়ি-ভুঁড়ি স্বচ্ছ করার ক্রিয়া (dhoti-poti) প্রত্যেক তৃতীয় দিন বাবা মস্‌জিদ থেকে খানিকটা দূরে একটা বট বৃক্ষের নীচে করতেন। একবার লোকেরা দেখে যে তিনি নিজের নাড়ি-ভুঁড়ী পেট থেকে বার করে ভালোভাবে পরিস্কার করে কাছের গাছে শুকোবার জন্যে রেখে দিয়েছেন। শিরডীতে এখনো এমন কয়েকটি লোক বেঁচে আছেন, যাঁরা এই ঘটনাটির পুষ্টি করতে পারেন। ওঁরা এর সত্যতাও পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণতঃ এই ক্রিয়াটি যেভাবে করা হয়, তার থেকে বাবার ক্রিয়াটি বিচিত্র ও অসাধারণই ছিল।

২) খন্ডযোগ - একবার বাবা নিজের অঙ্গপ্রতঙ্গ পৃথক-পৃথক করে মস্‌জিদের ভিন্ন-ভিন্ম স্থানে ছড়িয়ে দেন। হঠাৎ ঐ দিনই এক মহাশয় মস্‌জিদে আসেন এবং শরীরের অঙ্গগুলিকে এদিক-ওদিক ছড়ানো দেখে খুবই ভয় পেয়ে যান। প্রথমে ওঁর মনে হয় যে, গ্রাম অধিকারীকে এই খবরটি দেওয়া উচিত যে বাবাকে কেউ খুন করে তাঁকে টুকরো-টুকরো করে কেটে দিয়েছে। কিন্তু বার্তাবাহকই প্রথমে ধরা পড়ে, এই কথা ভেবে সে কোন রকম উচ্চবাচ্য করে না। পরের দিন মস্‌জিদ পৌঁছে বাবাকে আগের মতনই হৃষ্ট-পুষ্ট ও সুস্থ দেখে ওর খুবই আশ্চর্য্য লাগে। ওঁর মনে হয়- "গতকালের ঘটনাটি কি তাহলে স্বপ্ন ছিল?" বাবা ছোটবেলা থেকেই যৌগিক ক্রিয়া করতেন। তিনি কতখানি পারদর্শী হয়েছিলেন সে কথা কেউ জানত না। চিকিৎসার নামে তিনি কারো কাছ থেকে এক পয়সাও নেননি। তাঁর উত্তম, লোকপ্রিয় গুণের জন্য তাঁর কীর্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অনেক গরীব রোগীদের সুস্থ

করে দিয়েছিলেন। এই সুবিখ্যাত বৈদ্যচূড়ামনি নিজের স্বাস্থের কথা চিন্তা না করে অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে এবং নিজে অসহ্য বেদনা ও কষ্ট সহ্য করে সর্বদা অন্যদের উপকার করেছেন এবং তাদের বিপদে সাহায্য করেছেন। তিনি সব সময় পরকল্যাণার্থে চিন্তিত থাকতেন। এমনি একটা ঘটনা নীচে লেখা হচ্ছে, যেটি বাবার সর্বব্যাপকতা ও দয়ালুতা প্রমাণ করে।

বাবার সর্বব্যাপকতা ও দয়ালুতা ঃ-

১৯১০ সালে কালী পূজোর (দীপাবলী) শুভদিনে বাবা ধুনির কাছে বসেছিলেন। ধুনিতে কাঠ দিচ্ছিলেন ও হাত সেঁকছিলেন। ধুনি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বাবা কাঠের জায়গায় নিজের হাতটা ধুনিতে দিয়ে দেন। ফলতঃ হাতটা গুরুতর ভাবে জ্বলে যায়। শামা ও ভৃত্য মাধব বাবাকে জোর করে পেছনে টেনে নেন। মাধবরাও ব্যাকুল হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "দেব, আপনি এ কি করলেন? কেন করলেন?" বাবা এর উত্তরে জানান- "এখান থেকে একটু দূরে এক কর্মকারের বৌ হাপর দিচ্ছিল। সেই সময় ওর বর ওঁকে ডাক দেয়। কোমরে বাঁধা শিশুর কথা ভুলে উঠতে গিয়ে তার শিশুটি অগ্নিকুন্ডে পড়ে যায়। তাই আগুনে হাত দিয়ে শিশুটিকে বাঁচালাম। আমার হাত জ্বলে গেছে, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু একটি নির্দোষ শিশুর প্রাণ বেঁচে গেল, এটাই বড় কথা।

কুষ্ঠ রোগীর সেবা ঃ-

মাধবরাও দেশপান্ডের মাধ্যমে বাবার হাত জ্বলার সংবাদ পেয়েই শ্রী নানা সাহেব চাঁদোরকর বম্বের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রী পরমানন্দের সাথে ওষুধ, প্রলেপ এবং পট্টী ইত্যাদি নিয়ে শীঘ্রই শিরডী পৌঁছান। উনি বাবাকে শ্রী পরমানন্দকে তাঁর হাতের চিকিৎসা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বাবা ওঁর এই প্রার্থনাটি প্রত্যাখ্যান করে দেন। এক কুষ্ঠ রোগী ভাগোজী শিন্দে রোজ হাতের পোড়া জায়গাটির উপর ঘি লাগিয়ে, তার উপর একটা পাতা রেখে শক্ত করে একটা পট্টি বেঁধে দিতেন। ক্ষতটি যাতে তাড়াতাড়ি সেরে যায়, সেই চিন্তায় নানাসাহেব বার-বার বাবাকে পট্টীটা খুলে দিতে ও শ্রী পরমানন্দকে চিকিৎসা করতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। এমন কি ডাক্তারও কতবার তাকে মিনতি করেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই বাবা এই বলে মানা করে দিতেন- "ভগবানই আমার ডাক্তার।" বাবা হাত নিরীক্ষণ করার অনুমতি শেষ পর্যন্ত দেননি। ডাক্তার পরমানন্দের ওষুধ শিরডীর বায়ূমণ্ডলে খুলতে পারেনি

এবং কোন কাজেও লাগতে পারেনি। তবুও শ্রী পরমানন্দ খুবই সৌভাগ্যশালী যে, তিনি বাবার দর্শন পান। কিছুদিন পর যখন ক্ষতটি ভরে যায়, তখন সব ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু বাবার হাতে একটু ব্যথা রয়ে গিয়েছিল কিনা, সেটা কেউ জানতে পারে নি। বাবার সমাধির দিন পর্যন্ত রোজ সকালে ভাগোজী বাবার হাতটি ঘি দিয়ে মালিশ করে তার উপর পট্টী বেঁধে দিতেন। শ্রী সাইবাবার মত সিদ্ধপুরুষের এইরূপ চিকিৎসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে তিনি ভাগোজীর এই সেবা (অর্থাৎ উপাসনা) স্বীকার করেন। যখনই বাবা লেন্ডীতে বেড়াতে যেতেন, ভাগোজী ছাতা নিয়ে বাবার পেছনে-পেছনে চলতেন। প্রতি দিন বাবা ভোরবেলা যখন ধুনির কাছে এসে বসতেন, ভাগোজী আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং নিজের কাজ অবিলম্বে শুরু করে দিতেন। ভাগোজী পূর্বজন্মে অনেক পাপকর্ম করেছিলেন। তাই ওঁকে কুষ্ঠ রোগে ভুগতে হয়। ওঁর আঙ্গুল গলে গিয়েছিল ও শরীর পুঁজে ভরে গিয়েছিল। শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোত। এরূপ অবস্থায় ওঁকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক, কিন্তু বাবার প্রধান সেবক রূপে স্বীকৃত হওয়ার ফলস্বরূপ উনিই আসলে বেশী ভাগ্যবান ও সুখী ছিলেন। উনি বাবার সান্নিধ্যের পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করেন।

বালক খাপর্ডের প্লেগ ঃ-

এবার আমি বাবার অন্য একটি লীলা বর্ণনা করব। শ্রীমতি খাপার্ডে (অমরাবতীর শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডের স্ত্রী) নিজের ছোট ছেলের সাথে বেশ কয়েক দিন ধরে শিরডীতে থাকছিলেন। হঠাৎ একদিন ছেলের খুব জ্বর হয় ও প্লেগের গিল্‌টী (গাঁট) বেরিয়ে আসে। শ্রীমতি খাপার্ডে খুব ভয় পেয়ে যান এবং অমরাবতী ফিরে যেতে উদ্যত হন। সন্ধ্যাবেলায় বাবা যে সময় বেড়াতে বেরোন সেই সময় শ্রীমতী খাপার্ডে বাবার কাছে গিয়ে কম্পিত স্বরে বলেন- "আমার প্রিয় পুত্রের প্লেগ হয়েছে তাই এবার আমি বাড়ী ফিরতে চাই।" বাবা শান্ত মনে তাঁর সমস্যার সমাধান করে বলেন- "আকাশে খুব মেঘ করেছে। মেঘ সরে যেতেই আকাশ আবার আগের মতন স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" এই বলে তিনি নিজের কফ্‌নীটা কোমর পর্যন্ত তুলে সেখানে উপস্থিত সব ভক্তদের চারটে ডিমের আকারের গাঁট দেখিয়ে বলেন- "দেখ, ভক্তদের জন্য আমি সব রকমেরই কষ্ট সহ্য করি। ওদের কষ্ট আমার কষ্ট।" এই অদ্ভুত ও অসাধারণ লীলা দেখে ভক্তদের কোন সন্দেহ রইল না যে, সন্তরা ভক্তদের কল্যাণার্থে কতরকম কষ্ট নিজেদের উপর নিয়ে নেন। তাঁদের হৃদয় মোমের চেয়েও নরম এবং মাখনের

মত কোমল হয়। তাঁরা অকারণেই ভক্তদের প্রেম করেন ও তাদের নিজের পরম আত্মীয় মনে করেন।

পন্ঢরপুর যাত্রা ও সেখানে থাকা ঃ-

বাবা নিজের ভক্তদের কত ভালবাসতেন এবং কিভাবে তাদের মনের সমস্ত ইচ্ছে ও কথাগুলি আগেই জেনে জেতেন, সেইটা বর্ণনা করে এই অধ্যায়টি শেষ করব।

নানাসাহেব চাঁদোরকর বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। উনি খানদেশে নন্দুর বারেতে মাম্‌লৎদর ছিলেন। কিছুদিন পর ওঁর পন্ঢরপুরে স্থানান্তরণ হয়। বাবার ভক্তির ফলস্বরূপ উনি পন্ঢরপুরে (যাকে ভূবৈকুণ্ঠ মানা হয়) থাকার সুযোগ পান। নতুন জায়গায় কাজ সামলাবার আগে উনি তাঁর পন্ঢরপুরে (শিরডী) নিজের বিঠোবাকে (শ্রী বাবা) প্রণাম করে পন্ঢরপুরের জন্য রওনা হতে চাইছিলেন। সময়াভাবে কোন পত্র বা খবর না দিয়েই, অতি শীঘ্র শিরডীর জন্য বেরিয়ে পড়েন। সুতরাং নানা সাহেবের আগমনের বিষয় কেউ কিছু জানত না। কিন্তু বাবা তো অন্তর্যামী। তাঁর কাছে কিই বা লুকানো যায়? তিনি তো সর্বজ্ঞ। যে সময় নানা সাহেব নিমগ্রামে (শিরডী থেকে ২-৩ মাইল দূর) পৌঁছুন সেই সময় বাবা মহালসাপতি, অপ্পা শিন্দে এবং কাশীরামের সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ মস্‌জিদে একটা স্তব্ধতা ছেয়ে গেল এবং বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন- " চলো চারজনে মিলে ভজন গাই - পন্ঢরপুরের দ্বার খোলা আছে - চলো সবাই মিলে প্রেমপূর্বক গাই (পন্ঢরপুরলা জায়াঞ্চে জায়াঞ্চে, তিথেঞ্চ মজলা, রাহাঞ্চি তিথেঞ্চে মজলা রাহাঞ্চে ঘরতে মাঝ্য়া রায়াঞ্চে)।" ভজনের ভাবার্থ - আমায় পণ্ঢরপুরে গিয়ে থাকতে হবে। কারণ ঐটি আমার স্বামী অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘর। বাবার সাথে-সাথে সব ভক্তরা এই ভজনটি গাইতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর নানাসাহেব সপরিবারে সেখানে পৌঁছে বাবাকে প্রণাম করেন। তিনি বাবাকে পণ্ঢরপুরে স্থানান্তরনে খবর দিয়ে তাঁর সাথে পণ্ঢরপুর যেতে অনুরোধ করেন। ভক্তরা নানাসাহেবকে জানান যে বাবা স্বয়ং ওনার আসার আগে থেকেই পণ্ঢরপুরে থাকার আনন্দে বিভোর এবং তাঁর এই প্রার্থনার আবশ্যকতা বাবা নিজেই দূর করে দিয়েছেন। এই কথা শুনে নানাসাহেব বাবার চরণে লুটিয়ে পড়েন এবং বাবার আশীর্বাদ ও উদী নিয়ে পণ্ঢরপুর অভিমুখে প্রস্থান করেন। বাবার লীলা অনন্ত। অন্যান্য বিষয় - যেমন মানব জন্মের মাহাত্ম্য, বাবার ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ, বায়জাবাইয়ের সেবা এবং অন্য ঘটনাগুলি পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য রেখে আমরা এইখানে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।